ASANNAGAR M.M.T COLLEGE
DEPARTMENT OF HISTORY
HONOURS COURSE
SEMESTER -V
NAME OF THE TEACHER:PARTHA ROY CHOWDHUR

ইঙ্গ- মহীশূর যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা করো।

প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ :-1767 খ্রিস্টাব্দে ভেরেলেস্ট বাংলার গভর্নর হয়ে আসেন। এই সময় ভারতের মারাঠা মহীশূর রাজ্য ছিল ইংরেজদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী এবং ভারতে ইংরেজ শক্তি সম্প্রসারনের পথে প্রধান অন্তরায়। এ সময় মহীশূরে হায়দার আলি এর উত্থান ঘটলে দাক্ষিণাত্যের অপর তিন শক্তি ইংরেজ মারাঠা হায়দ্রাবাদের নিজাম আতঙ্কিত হয়ে ওঠে এবং হায়দারের বিরুদ্ধে তারা একটি শক্তিজোট গঠন করেন (1766 খ্রিস্টাব্দে)। 1767 খ্রিস্টাব্দে প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ শুরু হয় শেষ পর্যন্ত 1769 খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা হায়দার আলীর সঙ্গে সাক্ষরে করতে বাধ্য হয়।এই সন্ধি মাদ্রাজের সন্ধি (১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে) নামে পরিচিত। এই সন্ধির মাধ্যমে কোন সমস্যা সমাধান হয়নি।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ :1772 খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস গভর্নর হয়ে ভারতে আসেন। 1780খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা মহীশুরের অন্তর্গত ফরাসি বাণিজ্যিক কেন্দ্র মাহে দখল করলে হায়দার আলী ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। এবং দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধ চলাকালীন হায়দার আলীর মৃত্যু ঘটে(1782 খ্রিস্টাব্দে) কিন্তু তার বীরপুত্র টিপু সুলতান এই যুদ্ধ চালিয়ে যান। 1784 খ্রিস্টাব্দে ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি দ্বারা দ্বিতীয ইঙ্গ মহীশূর যুদ্ধ অবসান ঘটে এবং একে অন্যের অধিকৃত স্থানগুলি পরস্পরকে ফেরত দেন ওয়ারেন হেস্টিংস এই সন্ধিকে ‘অপমানজনক শান্তি ‘বলে অভিহিত করেছেন।

তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ :লর্ড কর্নওয়ালিস আমলে ইঙ্গ-মহীশূর সম্পর্ক আবার তিক্ত হয়ে ওঠে। ইংরেজ মহীশূর দুইপক্ষের জানত যে ব্যাঙ্গালোরে সন্ধি একটি সাময়িক যুদ্ধবিরতি মাত্র। এইজন্যই দুই পক্ষই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল। 1790 খ্রিস্টাব্দের টিপু ইংরেজদের মিত্র রাজ্য আক্রমণ করলে তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ শুরু হয়। নিজাম ও মারাঠা ইংরেজ পক্ষে যোগদান করেন। দুই বছর ধরে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের পর ত্রিশক্তি জোটের কাছে টিপু পরাজিত হন। তাঁর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তম অধিকৃত হয় এবং তিনি শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধি (1792 খ্রিস্টাব্দে) স্বাক্ষরে বাধ্য হন।এই সন্ধির দ্বারা -(১)টিপু তার রাজ্যের অর্ধাংশ ইংরেজদের ছেড়ে দেন। নিজাম, মারাঠা ও ইংরেজরা এই অংশটি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেন।(২)টিপু ইংরেজদের ৩কোটি ৩০লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মতি হন।সন্ধির দ্বারা দাক্ষিণাত্য ইংরেজদের শক্তি বৃদ্ধি পায়।

চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ :লর্ড ওয়েলেসলি ঘোরতর সাম্রাজ্যবাদী শাসক ছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে বিস্তারে উদ্দেশ্যে তিনি অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি নামে এক সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করেন। এতে বলা হয়েছে যে সমস্ত দেশীয় রাজা এই নীতি মেনে নেবে কোম্পানি তাদের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক আক্রমণ থেকে রক্ষা করবে। কিন্তু কোম্পানির বিনা অনুমতিতে কোন যুদ্ধ ঘোষণা শান্তি স্থাপন করা যাবে না। এইসব দেশীয় রাজ্য একদল ইংরেজ সৈন্য থাকবে এবং তাদের ব্যয় নির্বাহের জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্যের কিছু অংশ ইংরেজদের ছেড়ে দিতে হবে। এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করা ছিল পরাধীনতার চুক্তিতে স্বাক্ষরের নামান্তর। সমস্ত দেশীয় রাজ্য যখন একের পর এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করছে তখন টিপু সুলতানকে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করার জন্য প্রস্তাব পাঠান ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি।কিন্তু টিপু সুলতান এই প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলে চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ শুরু হয়(১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে)। সদাশির ও মলভেরি পর পর দুটি যুদ্ধে পরাজিত হয়ে টিপু তার

রাজধানীর শ্রীরঙ্গপত্তমের আশ্রয় নেন। শত্রুপক্ষ রাজধানী অবরোধ করে এবং তিনি যুদ্ধে পরাজিত নিহত হন। এরপর মহীশূর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে মারাঠা শক্তি পতনের কারণ কী ছিলো?

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পর মারাঠা শক্তির পতন শুরু হয়। উত্তরও দক্ষিণ ভারতের এক বিশাল অংশে মারাঠা প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।এমনকি স্বয়ং মোগল সম্রাট ও তাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন ইংরেজদের আবির্ভাবে মারাঠা অগ্রগতি প্রতিহত হয় এবং ইংরেজদের অধিক আক্রমণের ফলে তাদের পতন ঘটে। ঐতিহাসিক গ্র্যান্ট বলেন মারাঠাদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের দ্রুত এবং মারাঠাদের দ্রুত পতন ছিল বিস্ময়কর ইংরেজের কাছে মারাঠাদের পরাজয় এবং মারাঠা শক্তির পতন পশ্চাতে নানা কারণ বিদ্যমান।

★মারাঠা রাষ্ট্র কোনও সুসংহত ঐক্যবদ্ধ ছিল না। ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার বলেন যে তাদের ঐক্য ছিল সম্পূর্ণভাবে কৃত্রিম ও আকস্মিক এবং সেই কারণেই সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। মধ্যভারতের এক বিশাল অংশের মারাঠা আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলেও মারাঠা রাজ্যকে একটি শক্তি-সংঘ ব্যতীত অন্য কিছু বলা যায় না। ইন্দোর হোলকার নাগপুরের ভোঁসলের বরদায় গায়কোয়াড় গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া এবং ধার অঞ্চল পাওয়ার বংশের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বংশগুলি আইনত পেশোয়ার কর্তৃত্বাধীন হলেও তারা পেশোয়ার কর্তৃত্বাধীন হলেও তারা পেশোয়াকে আমল না দিয়ে কার্যত স্বাধীনভাবেই রাজত্ব চালাতো এবং তারা সর্বদাই পারস্পারিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকতো। এই সব মারাঠা সামন্তরাজা মারাঠা জাতির সামগ্রিক স্বার্থকে কখনোই ব্যক্তিস্বার্থের ওপরে স্থান দেননি। দ্বিতীয় ইঙ্গ মারাঠা যুদ্ধের সময় সিন্ধিয়া ও ভোঁসলে যখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত তখন হোলাকার ও গায়কোয়াড় ইংরেজদের সাহায্য করেছিলেন। মারাঠা নেতৃবৃন্দের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও স্বার্থপরতা তাদের পতনকে ত্বরান্বিত করে।

★একই সময়ের পর পর কয়েকজন নেতা অহল্যবাঈ, হোলকার, নানা ফড়নবীশ, মহাদজি সিন্ধিয়া প্রমুখ দুরদর্শী নেতার মৃত্যু মারাঠা রাষ্ট্রে এক গভীর শূন্যতার
 সৃষ্টি করে। পরবর্তী প্রজন্মের যেসব নেতার আবির্ভাব হয় তারা ছিলেন অপদার্থ ও কর্ম ও স্বার্থপর জাতীয় স্বার্থের সম্পর্কে উদাসীন এইসব স্বার্থান্ধ নেতাদের উত্থান মারাঠাদের পতন কে সুনিশ্চিত করে তোলে।

★স্যার যদুনাথ সরকারের মতে মারাঠা রাষ্ট্রের পশ্চাতে কোন আদর্শবাদ বা নৈতিক ভিত্তি ছিল না। মারাঠা প্রচাসনের দুর্নীতিগ্রস্ত গুপ্তচর শোষণ মারামারি সাধারণ বৈশিষ্ট্য পূর্ণবর্গ হিন্দু বাদশাহী আদর্শ ত্যাগ করে হিন্দু রাজন্যবর্গের ওপর আক্রমণ হিন্দু রাজ্য লুন্ঠন সরদেশমুখী আদায়ের নীতি গ্রহণ করলে নৈতিক ভিত্তি এবং উত্তর ভারতের হিন্দু জনসাধারণের শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে। অপরদিকে মারাঠা রাজন্যবর্গের হিন্দুয়ানির আদর্শ মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মনে ভীতির সঞ্চার করে এই কারণে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম মারাঠারা কোন প্রতিবেশী রাজ্যের সাহায্য পায়।

★পর্বত সংকুল অনুর্বর মহারাষ্ট্রে কৃষিব্যবস্থার উন্নতি ছিলনা। মারাঠা নেতৃত্বেমণ্ডলীয় শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি ঘটিয়ে সুদূর অর্থনীতি গড়ে তোলার কোনও চেষ্টা করেননি। এই অবস্থায় প্রতিবেশী রাজ্য থেকে বলপূর্বক যৌথ ও সরদেশমুখী আদায় করে তারা তাদের আর্থিক ঘাটতি পূরণ করত। এই দুটি কর আদায় করে তারা তাদের আর্থিক ঘাটতি পূরণ করত।এই দুই কর আদায় করার জন্য তারা তাদের বিশাল সেনাবাহিনী রাখতে হতো। যাদের বেতন দেওয়া ছিল এক কঠিন সমস্যা। বেতনের অভাবে সেনাদল প্রায়ই বিদ্রোহ ঘোষনা করত। সামন্ততন্ত্র শাসিত মহারাষ্ট্র কৃষকদের অবস্থা ছিলো শোচনীয়। জায়গিরদার,প্যাটেল ও অন্যান্য মধ্যস্বত্বভোগীদের লক্ষ্যই ছিল প্রজা-শোষণের মাধ্যমে অধিকতর রাজস্ব আদায়।কৃষকদের স্বার্থরক্ষায় পেশোয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হন এবং পেশোয়া বিরোধী হয়ে ওঠে।এইসব অর্থনৈতিক দুর্বলতা মারাঠাদের পতনের পথকে প্রশস্ত করে।

★মারাঠা সাম্রাজ্য ব্যবস্থার চূড়ান্ত অবক্ষয় ও জনসাধারণের মধ্যে প্রগতিশীল শিক্ষা ও মূল্যবোধ প্রসার নেতৃত্বমণ্ডলীর অনীহা মারাঠা শক্তির পতন এর অন্যতম কারণ। আর.ভি.নাদকার্নী -র মতে সামাজিক অনগ্রসরতা ও অবক্ষয়ের মধ্যে মারাঠাদের পতনের কারণ লুকিয়ে আছে। মদ্যপান ইন্দ্রিয়াসক্তি ও নৈতিক অধঃপতন সামাজিক পরিবেশকে কলুষিত করেছিল। মারাঠা নেতৃমন্ডলীও এই দোষগুলি থেকে মুক্ত ছিল না। এছাড়া নানা কুসংস্কার ডাইনিপ্রথা, বহুবিবাহ, শিশুবিবাহ, জ্যোতিষের প্রতি প্রবল আস্থা সামাজিক অগ্রগতিতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

★মারাঠা রাষ্ট্রের সামরিক ভিত্তি ছিল দুর্বল পেশোয়াদের শাসনাধীন মারাঠা সেনাদল তার জাতীয় চরিত্র হারায় উত্তর ভারতীয় হিন্দু মুসলিম, খ্রিস্টান ও আরবদের নিয়ে গঠিত মারাঠা সেনাদল ছিল মূলত একটি বহুজাতিক সংগঠন। বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের মানুষদের নিয়ে গঠিত এই সেনাদলের কোনও ঐক্য বা সংহতি ছিল না। এছাড়া মারাঠারা তাদের চিরাচরিত অশ্বারোহী বাহিনী ও গেরিলা যুদ্ধ পদত্যাগ করে মারাঠারা ইউরোপীয় রণকৌশল গ্রহণ করেছিল কিন্তু এতেও তারা সুশিক্ষিত হয়ে উঠতে পারেনি মারাঠা গোলন্দাজ বাহিনী ইউরোপীয় ফরাসিদের দ্বারা পরিচালিত হতে বিপদের সময় তাদের কাছ থেকে যথাযোগ্য সাহায্য পাওয়া যায়নি এবং মারাঠা গোলন্দাজ বাহিনী ইউরোপীয় ফরাসি উপনিবেশ দ্বারাই পরিচালিত হতো বিপদের সময় তাদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যায়নি বরং তারা অনেক সময় সংঘাতে বিশ্বাসঘাতকতা করে ইংরেজ পক্ষে যোগদান করে। এছাড়া মারাঠা বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন দ্বিতীয় বাজিরাও এবং দৌলতরাও বলাবাহুল্য যুদ্ধ পরিচালনায় তারা কোনও কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি।